আল ফজর্

৮৯

নামকরণ

প্রথম শব্দ وَالْفَجْرِ কে এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এই সূরার বিষয়বস্তু থেকে জানা যায়, এটি এমন এক যুগে নাযিল হয় যখন মক্কা মুয়ায্‌যমায় ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর ব্যাপকভাবে নিপীড়ন নির্যাতন চলছিল। তাই মক্কাবাসীদেরকে আদ, সামূদ ও ফেরাউনের পরিণাম দেখিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের সত্যতা প্রমাণ করা। কারণ মক্কাবাসীরা একথা অস্বীকার করে আসছিল। এ উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক পর্যায়ে যে যুক্তি পেশ করা হয়েছে সে ধারাবাহিকতা সহকারে এ বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে।

প্রথমে ফজর, দশটি রাত, জোড় ও বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের কসম খেয়ে শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যে বিষয়টি তোমরা অস্বীকার করছো তার সত্যতার সাক্ষ দেবার জন্য কি এই জিনিসগুলো যথেষ্ট নয়? সামনের দিকে টীকায় আমি এ চারটি জিনিসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা থেকে জানা যাবে যে, দিনরাত্রির ব্যবস্থায় যে নিয়মানুবর্তিতা দেখা যায় এগুলো তারই নির্দশন। এগুলোর কসম খেয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করার পরও যে আল্লাহ এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি আখেরাত কায়েম করার ক্ষমতা রাখেন এবং মানুষের কাছ থেকে তার কার্যাবলীর হিসেব নেয়া তাঁর এ বিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য দাবী, একথার সাক্ষ প্রমাণ পেশ করার জন্য কি আর কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকে?

এরপর মানব জাতির ইতিহাস থেকে প্রমাণ পেশ করে উদাহরণ স্বরূপ আদ ও সামূদ জাতি এবং ফেরাউনের পরিণাম পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন তারা সীমা পেরিয়ে গেছে এবং পৃথিবীতে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তখন আল্লাহর আযাব তাদেরকে গ্রাস করেছে। একথা প্রমাণ করে যে, কোন অন্ধ–বধির শক্তি এই বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছে না এবং এ দুনিয়াটা কোন অথর্ব রাজার মগের মুল্লুকও নয়। বরং একজন মহাবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী শাসক এ বিশ্ব–জাহানের ওপর কর্তৃত্ব করছেন। তিনি বুদ্ধি–জ্ঞান ও নৈতিক অনুভূতি দান করে যেসব সৃষ্টিকে এ দুনিয়ায় স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়েছেন তাদের কাজের হিসেব–নিকেশ করা এবং তাদেরকে শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া তাঁর জ্ঞানবত্তা ও ন্যায়পরায়ণতার অনিবার্য দাবী। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা এর অবিচ্ছিন্ন প্রকাশ দেখি।

তারপর মানব সমাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আরব জাহেলিয়াতের অবস্থা সে সময় সবার সামনে বাস্তবে সুস্পষ্ট ছিল। বিশেষ করে তার দু'টি দিকের সমালোচনা করা হয়েছে। এক, সাধারণ মানুষের বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগী। যার ফলে তারা নৈতিক ভালো–মন্দের দিকটাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র পার্থিব ধন–দওলাত, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জন বা এর অভাবকে সম্মান লাভ ও সম্মানহানির মানদণ্ড গণ্য করেছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল, সম্পদশালিতা কোন পুরস্কার নয় এবং আর্থিক অভাব অনটন কোন শাস্তি নয় বরং এ দুই অবস্থাতেই মহান আল্লাহ মানুষের পরীক্ষা নিচ্ছেন। সম্পদ লাভ করে মানুষ কি দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বন করে এবং আর্থিক অনটন ক্লিষ্ট হয়ে সে কোন পথে চলে—এটা দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য। দুই, লোকদের সাধারণ কর্মনীতি। পিতার মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের সমাজে এতিম ছেলেমেয়েরা চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। গরীবদের খবর নেবার এবং তাদের পক্ষে কথা বলার একটি লোকও পাওয়া যায় না। যার ক্ষমতা থাকে সে মৃতের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে বসে। দুর্বল হকদারদের খেদিয়ে দেয়া হয়। অর্থ ও সম্পদের লোভ একটি দুর্নিবার ক্ষুধার মতো মানুষকে তাড়া করে ফেরে। যত বেশী পায় তবুও তার পেট ভরে না। দুনিয়ার জীবনে যেসব লোক এ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বন করে তাদের কাজের হিসেব নেয়া যে ন্যায়সংগত, লোকদের কাছ থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করাই হচ্ছে এ সমালোচনার উদ্দেশ্য।

সবশেষে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, সমালোচনা ও হিসেব–নিকেশ অবশ্যি হবে। আর সেদিন এই হিসেব–নিকেশ হবে যেদিন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে। শাস্তি ও পুরস্কার অস্বীকারকারীদেরকে হাজার বুঝালেও আজ তারা যে কথা মেনে নিতে পারছে না। সেদিন তা তাদের বোধগম্য হবে। কিন্তু তখন বুঝতে পারায় কোন লাভ হবে না। অস্বীকারকারী সেদিন আফসোস করে বলবে ঃ হায়, আজকের দিনের জন্য যদি আমি দুনিয়ায় কিছু সরঞ্জাম তৈরি করতাম। কিন্তু এই লজ্জা ও দুঃখ তাকে আল্লাহর আযাবের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে যেসব লোক আসমানী কিতাব ও আল্লাহর নবীগণের পেশকৃত সত্য পূর্ণ মানসিক নিশ্চিন্ততা সহকারে মেনে নিয়েছিল আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তারাও আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিদান পেয়ে সন্তুষ্ট হবে। তাদেরকে আহবান জানানো হবে, তোমরা নিজেদের রবের প্রিয় বান্দাদের অন্তরভুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।

وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝٤ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝٥

ফজরের কসম, দশটি রাতের, জোড় ও বেজোড়ের এবং রাতের কসম যখন তা বিদায় নিতে থাকে। এর মধ্যে কোন বুদ্ধিমানের জন্য কি কোন কসম আছে?[১]

১. এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। এমন কি জোড় ও বেজোড় সম্পর্কে ছত্রিশটি বক্তব্য পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনায় এগুলোর ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও সম্পর্কিত করা হয়েছে। কিন্তু আসলে রসূলুল্লাহ (সা) থেকে কোন ব্যাখ্যা প্রমাণিত নেই। নয়তো তাঁর ব্যাখ্যার পর সাহাবা, তাবেঈ ও পরবর্তী তাফসীরকারদের মধ্য থেকে কোন একজনও এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা নির্ধারণ করার সাহস করতেন না।

বর্ণনাভংগি সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়, প্রথম থেকে কোন আলোচনা চলছিল। সেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কথা পেশ করছিলেন এবং অস্বীকারকারীরা তা অস্বীকার করছিল। এ প্রসংগে রসূলের কথার সত্যতা প্রমাণ করে বলা হয়েছে, ওমুক ওমুক জিনিসের কসম। এর অর্থ ছিল, এই জিনিসগুলোর কসম, যা কিছু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন সব সত্য। তারপর এ প্রশ্নের ভিত্তিতে এ বক্তব্য পেশ করা হয়েছে যে, কোন বুদ্ধিমান লোকের জন্য কি এর মধ্যে কোন কসম আছে? অর্থাৎ এই সত্য কথাটির পক্ষে সাক্ষ দেবার জন্য এরপর কি আর কোন কসমের প্রয়োজন আছে? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কথা বলছেন তা জেনে নেবার জন্য কি একজন বুদ্ধি-বিবেকমান ব্যক্তির জন্য এই কসমই যথেষ্ট নয়?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে প্রসংগে এই চারটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তা কি ছিল? এ জন্য আমাদের পরবর্তী আয়াতগুলোতে "তুমি কি দেখনি তোমার রব তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছিলেন" থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত সমগ্র আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এ থেকে জানা যায়, আলোচনা চলছিল শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে। মক্কাবাসীরা একথা অস্বীকার করছিল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে এর স্বীকৃতি আদায় করার জন্য অনবরত তাদেরকে দাওয়াত ও উপদেশ দিয়ে চলছিলেন। এ জন্য ফজর, দশটি রাত, জোড়-বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের কসম

খেয়ে বলা হয়েছে, এই বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য এই চারটি জিনিস যথেষ্ট নয় কি? এ জন্য কোন বুদ্ধি–বিবেকবান ব্যক্তির সামনে কি আর কোন জিনিস পেশ করার প্রয়োজন আছে?

এই কসমগুলোর এই পরিবেশ–পরিস্থিতি নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী আলোচনা এগুলোর যে অর্থ নির্দেশ করে আমাদের অপরিহার্যভাবে সেই অর্থই গ্রহণ করতে হবে। প্রথমে বলা হয়েছে "ফজরের কসম"। ফজর বলা হয় প্রভাত হয়ে যাওয়াকে। অর্থাৎ যখন রাতের অন্ধকার ভেদ করে দিনের প্রথম আলোক রশ্মি পূর্বদিগন্তে একটি সাদা রেখার মতো আত্মপ্রকাশ করে। তারপর বলা হয়েছে "দশটি রাতের কসম।" ধারাবাহিক বর্ণনাগুলো সামনে রাখলে জানা যায়, এর অর্থ হচ্ছে মাসের তিরিশটি রাতের প্রত্যেক দশটি রাত। প্রথম দশটি রাতের চাঁদ সরু কাস্তের আকারে শুরু হয়ে প্রতি রাতে বাড়তে থাকে। এভাবে তার অর্ধেকেরও বেশী এলাকা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় দশটি রাতে চাঁদের আলোয় রাতের বৃহত্তম অংশ আলোকিত থাকে। শেষ দশটি রাতে চাঁদ আস্তে আস্তে একেবারে ছোট হয়ে যেতে থাকে এবং রাতের বেশীর ভাগ অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে। এমনকি মাসের শেষ রাতটি হয় পুরোপুরি অন্ধকার। এরপর বলা হয়েছে, "জোড় ও বেজোড়ের কসম।" জোড় বলা হয় এমন সংখ্যাকে যাকে দু'টি সমান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ২, ৪, ৬, ৮, ১০। অন্যদিকে বেজোড় বলা হয় এমন সংখ্যাকে যাকে সমান দু'ভাগে ভাগ করা যায় না। যেমন ১, ৩, ৫, ৭, ৯। সাধারণভাবে দেখলে এর অর্থ হতে পারে বিশ্ব–জাহানের সমস্ত জিনিস। কারণ প্রতিটি জিনিস হয় জোড়, নয় বেজোড়। কিন্তু যেহেতু এখানে দিন ও রাতের কথা আলোচনা হচ্ছে তাই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এখানে জোড় ও বেজোড় মানে হচ্ছে, দিন–রাত্রির পরিবর্তন। অর্থাৎ মাসের তারিখ এক থেকে দুই এবং দুই থেকে তিন হয়ে যায়। আর প্রত্যেকটি পরিবর্তন একটি নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে। সবশেষে বলা হয়েছে, "রাতের কসম যখন তা বিদায় নিতে থাকে।" অর্থাৎ সূর্য ডোবার পর থেকে পৃথিবীর বুকে যে অন্ধকার ছেয়ে ছিল তার অবসান ঘটেছে এবং আলোকময় উষার উদয় হতে যাচ্ছে।

এখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাস্তি ও পুরস্কারের যে খবর দিচ্ছিলেন তার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যে চারটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তাদের ওপর একবার সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করুন। এসব জিনিস এই সত্যটি প্রমাণ করছে যে, একজন মহাশক্তিশালী স্রষ্টা এই বিশ্ব–জাহানের ওপর রাজত্ব করছেন। তিনি যে কাজটিই করছেন, তা উদ্দেশ্যহীন, লক্ষহীন, অর্থহীন নয় এবং তার পেছনে কোন বিজ্ঞতাপূর্ণ পরিকল্পনা নেই একথা বলা যাবে না। বরং তাঁর প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে একটি স্পষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা সক্রিয় রয়েছে। তাঁর পৃথিবীতে কখনো এমন দেখা যাবে না যে, এখনই রাত আবার এখনই হঠাৎ সূর্য একেবারে মাথার ওপর উঠেছে। অথবা একদিন চাঁদ উঠলো কাস্তের মতো সরু হয়ে এবং তারপর দিন একেবারে গোল থালার মতো পূর্ণচন্দ্র আকাশে শোভা পেতে লাগলো। অথবা রাত এলো কিন্তু তা আর শেষই হচ্ছে না, স্থায়ীভাবে ঠায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো। অথবা আদতে দিন রাত্রির পরিবর্তনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থাই নেই। যার ফলে তারিখের হিসাব রাখা যায় না। আজ কোন্ মাসের কয় তারিখ, কোন তারিখে কোন্ কাজটি শুরু করা হয়েছিল এবং কবে খতম হবে,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝

তুমি[২] কি দেখনি তোমার রব সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী আদে-ইরামের[৩] সাথে কি আচরণ করেছেন, যাদের মতো কোন জাতি দুনিয়ার কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি?[৪] আর সামূদের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল?[৫] আর কীলকধারী ফেরাউনের[৬] সাথে? এরা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বড়ই সীমালংঘন করেছিল এবং সেখানে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। অবশেষে তোমার রব তাদের ওপর আযাবের কশাঘাত করলেন। আসলে তোমার রব ওঁৎ পেতে আছেন।[৭]

গ্রীষ্মকাল কবে থেকে শুরু হচ্ছে এবং বর্ষাকাল ও শীতকাল কবে আসবে—এসব জানা সম্ভব হয় না। বিশ্ব-জাহানের অন্যান্য অসংখ্য জিনিস বাদ দিয়ে মানুষ যদি শুধুমাত্র দিন রাত্রির এই যথা নিয়মে যাওয়া আসার বিষয়টি মনোযোগ সহকারে দেখে এবং এ ব্যাপারটি নিয়ে একটু মাথা ঘামায়, তাহলে এক সর্বশক্তিমান সত্তা যে এই বিরাট নিয়ম-শৃংখলা ও আইনের রাজত্ব কায়েম করেছেন এবং এই নিয়ম-শৃংখলার সাথে এখানে সৃষ্টজীবের অসংখ্য স্বার্থ ও কর্মপ্রবাহ জড়িত তার সাক্ষ-প্রমাণ সে এর মধ্যেই পেয়ে যাবে। এখন এই ধরনের জ্ঞানবান ও বিজ্ঞানময় এবং মহাশক্তিধর স্রষ্টার আখেরাতে শাস্তি ও পুরস্কার দেবার বিষয়টি যদি দুনিয়ার কোন মানুষ অস্বীকার করে তাহলে সে দু'টি নির্বুদ্ধিতার মধ্য থেকে কোন একটিতে অবশ্যি লিপ্ত। হয় সে তাঁর ক্ষমতা অস্বীকার করে এবং মনে করে তিনি এই অকল্পনীয় নিয়ম-শৃংখলা সহকারে এই বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করে তাকে শাস্তি ও পুরস্কার দান করার ক্ষমতা তাঁর নেই অথবা সে তাঁর জ্ঞানবত্তা ও বিজ্ঞানময়তা অস্বীকার করে এবং তাঁর সম্পর্কে একথা মনে করে নিয়েছে যে, তিনি মানুষকে দুনিয়ায় বুদ্ধি-বিবেক ও ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ঠিকই কিন্তু তিনি কখনো তার কাছ থেকে এই বুদ্ধি-বিবেক ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারকে সে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে তার হিসেব নেবেন না। আর তিনি ভালো কাজের পুরস্কার দেবেন না এবং খারাপ কাজের শাস্তিও দেবেন না। এই দু'টি কথার কোন একটিকেও যে ব্যক্তি মেনে নেবে সে একজন প্রথম শ্রেণীর নির্বোধ।

২. দিন-রাত্রির আবর্তন ব্যবস্থা থেকে শাস্তি ও পুরস্কার বিধানের প্রমাণ পেশ করার পর এখন তার নিশ্চিত সত্য হবার ব্যাপারে মানুষের ইতিহাস থেকে প্রমাণ পেশ করা

হচ্ছে। ইতিহাসের কয়েকটি পরিচিত জাতির কর্মপদ্ধতি ও তাদের পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে একথা বলার উদ্দেশ্যে যে, এই বিশ্ব–জাহান কোন অন্ধ ও বধির প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে না। বরং এক বিজ্ঞানময় আল্লাহ এই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। আর এই আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের মধ্যে তোমরা যাকে প্রাকৃতিক আইন মনে করো কেবলমাত্র সেই আইনটিই সক্রিয় নেই বরং এই সাথে একটি নৈতিক আইনও এখানে সক্রিয় রয়েছে, যার অনিবার্য দাবী হচ্ছে, কাজের প্রতিফল এবং শাস্তি ও পুরস্কার দান। এই আইন যে সক্রিয় রয়েছে তার চিহ্ন এই দুনিয়াতেই বার বার প্রকাশ হতে থেকেছে এবং তা থেকে বুদ্ধি–বিবেকবান মানুষ বিশ্ব–জাহানের শাসন কর্তৃত্বের প্রকৃতি ও স্বভাব সুস্পষ্টভাবে জানতে পেরেছে। এখানে যেসব জাতি আখেরাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এবং আল্লাহর শাস্তি ও পুরস্কারের ভয় না করেই নিজেদের জীবনের ব্যবস্থা পরিচালনা করেছে তারা পরিণামে বিপর্যস্ত হয়েছে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী রূপে আত্ম–প্রকাশ করেছে। আর যে জাতিই এ পথে চলেছে বিশ্ব–জাহানের রব তার ওপর শেষ পর্যন্ত আযাবের চাবুক বর্ষণ করেছেন। মানুষের ইতিহাসের এই ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা দু'টি কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে ঃ এক, আখেরাত অস্বীকার করার কারণে প্রত্যেক জাতি বিপথে পরিচালিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তা তাকে ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। কাজেই আখেরাত একটি যথার্থ সত্য। প্রত্যেক সত্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার যে ভয়াবহ পরিণতি হয় এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ফলও তাই হয়। দুই, কর্মফল কোন এক সময় পূর্ণ মাত্রায়ও দেয়া হবে। কারণ বিপর্যয় ও বিকৃতির শেষ পর্যায়ে এসে আযাবের চাবুক যাদের ওপর বর্ষিত হয়েছে তাদের পূর্বে শত শত বছর পর্যন্ত বহু লোক এই বিপর্যয়ের বীজ বপন করে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল এবং তাদের ওপর কোন আযাব আসেনি। আল্লাহর ইনসাফের দাবী এই যে, কোন এক সময় তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক এবং তারা কৃতকর্মের ফল ভোগ করুক। (কুরআন মজীদে আখেরাতের ব্যাপারে এই ঐতিহাসিক ও নৈতিক যুক্তির বিশ্লেষণ বিভিন্ন জায়গায় করা হয়েছে এবং সবজায়গায় আমি এর ব্যাখ্যা করেছি। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত জায়গাগুলো দেখুন ঃ তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আরাফ ৫–৬ টীকা, ইউনুস ১২, হূদ ৫৭, ১০৫, ১১৫ টীকা, ইবরাহীম ৯ টীকা, আন নহল ৬৬ ও ৮৬ টীকা, আররূম ৮ টীকা, সাবা ২৫ টীকা, সাদ ২৯ ও ৩০ টীকা, আল মু'মিন ৮০ টীকা, আদ দুখান ৩৩ ও ৩৪ টীকা; আল জাসিয়াহ–২৭ ও ২৮ টীকা, কাফ ১৭ টীকা এবং আয যারিয়াত ২১ টীকা।)

৩. 'আদে ইরাম' বলতে আদ জাতির সেই প্রাচীন ধারাটির কথা বুঝানো হয়েছে যাকে কুরআন মজীদ ও আরবের ইতিহাসে 'আদে উলা' (প্রথম) বলা হয়েছে। সূরা আন নাজমে বলা হয়েছে ঃ وَاَنَّهٗٓ اَهْلَكَ عَادَانِ الْاُوْلٰى "আর তিনি প্রাচীন আদ জাতিকে ধ্বংস করেছেন।" (৫০ আয়াত) অর্থাৎ সেই আদ জাতিকে যাদের কাছে হযরত হূদ আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছিল এবং যাদের ওপর আযাব নাযিল হয়েছিল। অন্যদিকে এই জাতির যেসব লোক আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার পর নিজেদের জাতি সত্তার সমৃদ্ধি সাধন করেছিল, আরবের ইতিহাসে তাদেরকে 'আদে উখ্‌রা' (দ্বিতীয় আদ) নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রাচীন আদ জাতিকে 'আদে ইরাম' বলার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা সিরিয় বংশজাত আদদের সেই বংশধারার সাথে সম্পর্কিত যাদের উদ্ভব হয়েছিল নূহ আলাইহিস সালামের নাতি ও সামের ছেলে ইরাম থেকে। ইতিহাসে আদদের এই শাখার আরো

কয়েকটি উপশাখা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। সামূদ এদের অন্যতম। কুরআনে এই জাতিটির উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আরামিয়ান (Arameana) জাতি। এরা প্রথমে সিরিয়ার উত্তর এলাকায় বসবাস করতো। এদের ভাষা আরামী (Aramic)। সিরিয়ার ভাষাগুলোর মধ্যে এই ভাষাটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

আদের জন্য 'যাতুল ইমাদ' (সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তারা বড় বড় উঁচু উঁচু ইমারত তৈরি করতো। দুনিয়ায় তারাই সর্বপ্রথম উঁচু উঁচু স্তম্ভের ওপর ইমারত নির্মাণ করার কাজ শুরু করে। কুরআন মজীদের অন্য জায়গায় তাদের এই বৈশিষ্টকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ হযরত হূদ (আ) তাদেরকে বলেন,

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ۚ

"তোমাদের এ কেমন অবস্থা, প্রত্যেক উঁচু জায়গায় অনর্থক একটি স্মৃতিগৃহ তৈরি করছো এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছো, যেন তোমরা চিরকাল এখানে থাকবে।" (আশ শু'আরা, ১২৮–১২৯)

৪. অর্থাৎ তারা সমকালীন জাতিদের মধ্যে ছিল একটি তুলনাবিহীন জাতি। শক্তি শৌর্য–বীর্য, গৌরব ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে সে যুগে সারা দুনিয়ায় কোন জাতি তাদের সমকক্ষ ছিল না। কুরআনের অন্যান্য স্থানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً। "দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তোমাদের অবয়বকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছেন। (আল আরাফ, ৬৯)

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً –

"আর তাদের ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়, তারা কোন অধিকার ছাড়াই পৃথিবীর বুকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করেছে। তারা বলেছে ঃ কে আছে আমাদের চাইতে বেশী শক্তিশালী?" (হা–মীম আস্ সাজ্দাহ, ১৫)

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ "আর তোমরা যখন কারোর ওপর হাত উঠিয়েছো প্রবল পরাক্রান্ত হয়েই উঠিয়েছো।" (আশ শু'আরা, ১৩০)

৫. উপত্যকা বলতে 'আলকুরা' উপত্যকা বুঝানো হয়েছে। সামূদ জাতির লোকেরা সেখানে পাথর কেটে কেটে তার মধ্যে গৃহ নির্মাণ করেছিল। সম্ভবত ইতিহাসে তারাই প্রথম জাতি হিসেবে চিহ্নিত যারা পাহাড়ের মধ্যে এভাবে ইমারত নির্মাণের রীতি প্রচলন করেছিল। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আরাফ ৫৭–৫৯ টীকা, আল হিজ্‌র ৪৫ টীকা এবং আশ্ শু'আরা ৯৫–৯৯ টীকা)

৬. ফেরাউনের জন্য 'যুল আউতাদ' (কীলকধারী) শব্দ এর আগে সূরা সাদের ১২ আয়াতেও ব্যবহার করা হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তার সেনাবাহিনীকে কীলকের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং সেই অর্থে কীলকধারী মানে সেনাবাহিনীর

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾

কিন্তু[৮] মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার রব যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তাকে সম্মান ও নিয়ামত দান করেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তার রিযিক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে হেয় করেছেন।[৯]

অধিকারী। কারণ তাদেরই বদৌলতে তার রাজত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যেমন কীলকের সাহায্যে তাঁবু মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এর অর্থ সেনা দলের সংখ্যাধিক্যও হতে পারে। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, তার সেনাদল যেখানে গিয়ে তাঁবু গাঁড়তো সেখানেই চারদিকে শুধু তাঁবুর কীলকই পোঁতা দেখা যেতো। আবার এর অর্থ সেই কীলকও হতে পারে যা মানুষের শরীরে গেঁড়ে দিয়ে সে তাদেরকে শাস্তি দিতো। এও হতে পারে, মিসরের পিরামিডগুলোকে কীলকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ সেগুলো ফেরাউনদের পরাক্রম ও শান-শওকতের নিদর্শন হিসেবে হাজার হাজার বছর থেকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

৭. জালেম ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কার্যকলাপের প্রতি নজর রাখার জন্য ওঁৎ পেতে থাকা প্রবাদটির ব্যবহার করা হয়েছে রূপক হিসেবে। কোন ব্যক্তির কারো অপেক্ষায় কোন গোপন স্থানে এই উদ্দেশ্যে লুকিয়ে বসে থাকা যে, তার আয়ত্বের মধ্যে আসার সাথে সাথেই সে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, একে বলা হয় ওঁৎপেতে থাকা। যার জন্য লুকিয়ে বসে থাকা হয় সে জানতে পারে না যে, তার ওপর আক্রমণ করার জন্য কেউ কোথাও লুকিয়ে বসে আছে। সে নিশ্চিন্তে চারদিক সম্পর্কে অসতর্ক হয়ে ঐ স্থান অতিক্রম করতে থাকে তখন অকস্মাৎ সে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দুনিয়ায় যেসব জালেম বিপর্যয়ের তুফান সৃষ্টি করে থাকে আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের অবস্থাও অনুরূপ হবে। আল্লাহ যে একজন আছেন এবং তিনি তার সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ রাখছেন, এ অনুভূতিই তার থাকে না। সে একেবারে নির্ভয়ে দিনের পর দিন বেশী বেশী শয়তানী কাজ করে যেতে থাকে। তারপর একদিন যখন সে এক সীমান্তে পৌঁছে যায় যেখান থেকে আল্লাহ তাকে আর এগিয়ে যেতে দিতে চান না, তখন তার ওপর হঠাৎ আল্লাহর আযাবের চাবুক বর্ষিত হয়।

৮. এখন লোকদের সাধারণ নৈতিক অবস্থার সমালোচনা করে বলা হচ্ছে, যেসব লোক দুনিয়ার জীবনে এই দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলীর হিসেব কখনো না নেয়ার কি কারণ থাকতে পারে? দুনিয়ায় এসব কাজ-কারবার করে যখন মানুষ বিদায় নেবে তখন তার কাজের জন্য সে কোন শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে না একে বুদ্ধি ও নৈতিক বৃত্তির দাবী বলে কেমন করে মেনে নেয়া যেতে পারে।

৯. অর্থাৎ এটি হচ্ছে মানুষের বস্তুবাদী জীবন দর্শন। এই দুনিয়ার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্বকেই সে সবকিছু মনে করে। এগুলো পেলে সে আনন্দে উল্লসিত হয় এবং বলে

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾ كَلَّا
إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ
الذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ
عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾

কখনই নয়,[১০] বরং তোমরা এতিমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না[১১] এবং মিসকীনকে খাওয়াবার জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।[১২] তোমরা মীরাসের সব ধন-সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলো[১৩] এবং ধন-সম্পদের প্রেমে তোমরা মারাত্মকভাবে বাঁধা পড়েছ।[১৪] কখনই নয়,[১৫] পৃথিবীকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করে বালুকাময় করে দেয়া হবে এবং তোমার রব এমন অবস্থায় দেখা দেবেন।[১৬] যখন ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেদিন জাহান্নামকে সামনে আনা হবে। সেদিন মানুষ বুঝবে কিন্তু তার বুঝতে পারায় কী লাভ?[১৭] সে বলবে, হায়, যদি আমি নিজের জীবনের জন্য কিছু আগাম ব্যবস্থা করতাম! সেদিন আল্লাহ যে শাস্তি দেবেন তেমন শাস্তি কেউ দিতে পারবে না। এবং আল্লাহ যেমন বাঁধবেন আর কেউ তেমন বাঁধতে পারবে না।

আল্লাহ্ আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। আবার না পেলে বলে, আল্লাহ আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব পাওয়া-নাপাওয়াই হচ্ছে তার কাছে মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড। অথচ প্রকৃত ব্যাপারটিই সে বোঝে না। আল্লাহ দুনিয়ায় যাকেই যা কিছুই দিয়েছেন পরীক্ষার জন্যই দিয়েছেন। ধন ও শক্তি দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। এগুলো পেয়ে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না অকৃতজ্ঞ হয়, তা তিনি দেখতে চান। দারিদ্র ও অভাব দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। ধৈর্য ও পরিতুষ্টি সহকারে মানুষ আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট থাকে এবং বৈধ সীমার মধ্যে অবস্থান করে নিজের সমস্যা ও সংকটের মোকাবিলা করে, না সততা, বিশ্বস্ততা ও নৈতিকতার সব বাঁধন ছিন্ন করে আল্লাহকেই গালমন্দ দিতে থাকে, তা আল্লাহ অবশ্যই দেখতে চান।

১০. অর্থাৎ এটি কখনই মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড নয়। তোমরা মস্তবড় ভুল করছো। একে সৎ চারিত্রিক মনোবৃত্তি ও অসৎ চারিত্রিক মনোবৃত্তির পরিবর্তে তোমরা মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছো।

১১. অর্থাৎ তার বাপ জীবিত থাকাকালে তার সাথে তোমরা এক ধরনের ব্যবহার করো। আর তার বাপ মারা যাবার সাথে সাথেই প্রতিবেশী ও দূরের আত্মীয়দের তো কথাই নেই, চাচা, মামা এমনকি বড় ভাই পর্যন্ত তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১২. অর্থাৎ তোমাদের সমাজে গরীবদের আহার করাবার কোন রেওয়াজই নেই। কোন ব্যক্তি নিজে অগ্রসর হয়ে কোন অভুক্তকে আহার করাবার উদ্যোগ নেয় না। অথবা ক্ষুধার্তদের ক্ষুধা নিবারণ করার কোন চিন্তাই তোমাদের মনে আসে না এবং এর ব্যবস্থা করার জন্য তোমরা পরস্পরকে উৎসাহিতও করো না।

১৩. আরবে মেয়েদের ও শিশুদের এমনিতেই মীরাস থেকে বঞ্চিত রাখা হতো। এ ব্যাপারে লোকেরা যে মত পোষণ করতো তা ছিল এই যে, মীরাস লাভ করার অধিকার একমাত্র এমন সব পুরুষের আছে যারা লড়াই করার ও পরিবারের লোকদের হেফাজত করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে। এছাড়াও মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হতো সে নিশ্চিন্তে সমস্ত মীরাস নিজের একার দখলে নিয়ে নিতো এবং যারা নিজেদের অংশ হাসিল করার ক্ষমতা রাখতো না তাদের সবারটা গ্রাস করে ফেলতো। অধিকার ও কর্তব্যের কোন গুরুত্বই তাদের কাছে ছিল না। অধিকারী নিজের অধিকার হাসিল করতে পারুক বা না পারুক ঈমানদারীর সাথে নিজের কর্তব্য মনে করে তাকে তার অধিকার প্রদান করার কথা তারা চিন্তাই করতো না।

১৪. অর্থাৎ বৈধ-অবৈধ ও হালাল-হারামের কোন পার্থক্যই তোমাদের কাছে নেই। যে কোন পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন করতে তোমরা মোটেই ইতস্তত করো না। যত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদই তোমরা লাভ করো না কেন তোমাদের লোভের ক্ষুধা মেটে না।

১৫. অর্থাৎ তোমাদের চিন্তা ভুল। তোমরা দুনিয়ায় যত দিন জীবন যাপন করবে, এসব কিছুই করতে থাকবে এবং এজন্য তোমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না, একথা ঠিক নয়। যে শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়টি অস্বীকার করে তোমরা এই জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করেছো সেটি কোন অসম্ভব ও কাল্পনিক ব্যাপার নয়। বরং সে বিষয়টি অবশ্যি সংঘটিত হবে। সামনের দিকে সেটি কখন সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬. মূলে বলা হয়েছে جَاءَ رَبُّكَ এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, "তোমার রব আসবেন।" তবে আল্লাহর জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই একে রূপক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। এর উদ্দেশ্য এমনি ধরনের একটি ধারণা দেয়া যে, সে সময় আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব, শাসন ও প্রতাপের নিদর্শনসমূহ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। দুনিয়ায় কোন বাদশাহর সমগ্র সেনাদল এবং তার মন্ত্রণাপরিষদ ও সভাসদদের আগমনে ঠিক ততটা প্রভাব ও প্রতাপ সৃষ্টি হয় না যতটা বাদশাহর নিজের দরবারে আগমনে সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টিই এখানে বুঝানো হয়েছে।

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

(অন্যদিকে বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা![১৮] চলো তোমার রবের দিকে,[১৯] এমন অবস্থায় যে তুমি (নিজের শুভ পরিণতিতে) সন্তুষ্ট (এবং তোমার রবের) প্রিয়পাত্র। শামিল হয়ে যাও আমার (নেক) বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।

১৭. মূলে বলা হয়েছে يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সেদিন মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু করে এসেছে তা স্মরণ করবে এবং সেজন্য লজ্জিত হবে। কিন্তু তখন স্মরণ করায় এবং লজ্জিত হওয়ায় কোন লাভ হবে না। দুই, সেদিন মানুষ সচেতন হবে। সে উপদেশ গ্রহণ করবে। সে বুঝতে পারবে, নবীগণ তাকে যা কিছু বলেছিলেন তাই ছিল সঠিক এবং তাদের কথা না মেনে সে বোকামি করেছে। কিন্তু সে সময় সচেতন হওয়ায়, উপদেশ গ্রহণ করায় এবং নিজের ভুল বুঝতে পারায় কী লাভ?

১৮. 'প্রশান্ত আত্মা' বলে এমন মানুষকে বুঝানো হয়েছে যে, কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ছাড়াই পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে ঠাণ্ডা মাথায় এক ও লা–শরীক আল্লাহকে নিজের রব এবং নবীগণ যে সত্য দীন এনেছিলেন তাকে নিজের দীন ও জীবন বিধান হিসেবে গণ্য করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছ থেকে যে বিশ্বাস ও বিধানই পাওয়া গেছে তাকে সে পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নিয়েছে। আল্লাহর দীন যে জিনিসটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তাকে সে অনিচ্ছা সত্ত্বে নয় বরং এই বিশ্বাস সহকারে বর্জন করেছে যে, সত্যিই তা খারাপ। সত্য–প্রীতির পথে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে নির্দ্বিধায় তা করেছে। এই পথে যেসব সংকট, সমস্যা, কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে হাসি মুখে সেগুলো বরদাশ্‌ত করেছে। অন্যায় পথে চলে লোকদের দুনিয়ায় নানান ধরনের স্বার্থ, ঐশ্বর্য ও সুখ–সম্ভার লাভ করার যেসব দৃশ্য সে দেখছে তা থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য তার নিজের মধ্যে কোন ক্ষোভ বা আক্ষেপ জাগেনি। বরং সত্য দীন অনুসরণ করার ফলে সে যে এই সমস্ত আবর্জনা থেকে মুক্ত থেকেছে, এজন্য সে নিজের মধ্যে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা অনুভব করেছে। কুরআনের অন্যত্র এই অবস্থাটিকে 'শারহে সদর' বা হৃদয় উন্মুক্ত করে দেয়া অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। (আল আন'আম, ১২৫)

১৯. একথা তাকে মৃত্যুকালেও বলা হবে, যখন কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে যেতে থাকবে সে সময়ও বলা হবে এবং আল্লাহর আদালতে পেশ করার সময়ও তাকে একথা বলা হবে। প্রতিটি পর্যায়ে তাকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দান করা হবে যে, সে আল্লাহর রহমতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।